# ম্যানগ্রোভ

পার্থসারথি গায়েন

অর্পিতা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা- ১২

'মার, মার-শালাকে, শালা চোর, পাকা চোর'! যে যেদিক থেকে পারছে কিল চড় ঘুঁষি লাথি মারছে দমাদম। ভোলাও এই বয়সে জেনে গেছে কী করে এইরকম মারের হাত হতে মুখ বাঁচাতে হয়। দু-চার ঘা মার পড়তেই সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। হৈ-চৈ গণ্ডগোলের শব্দ শুনে পাড়ার দু-চার জন মেয়েরাও ঘুম চোখে চলে এসেছে। একজন চেঁচিয়ে বললে—হায় হায়, এ ক্ষ্যায়কেশে মায়ের পূজোর ভোগ তো এঁটো করেছে; সেই সঙ্গে দেখ তোমরা, কী সর্বনাশ করেছে—তাড়াতাড়ি করে মিষ্টি-লুচি-সন্দেশ সরাতে গিয়ে মা লক্ষ্মীর কড়ে আঙুলটা একেবারে ভেঙে দিয়েছে। দেখি দেখি, বলে কয়েক জন দেখে বলে—আরে সত্যিই তো! জটলার ক্রোধ আরো বেড়ে গেল! আবার একঝুল বেদম প্রহার, ওর মধ্যে থেকে একজন বললে—দে শালাকে মেরে থেঁতলে দে। একটাও হাড় গোড় যেন গোটা না থাকে। একজন বলল—দ্যাখ, দেখে মনে হচ্ছে বয়েস বেশি নয়, খুব বেশি মারধোর করলে মরে যেতে পারে। শেষে থানা পুলিশ ঝামেলার একশেষ। তার চেয়ে বরং ওকে পিষমোড়া করে বেঁধে রেখে দাও—সকাল হোক, পালবাবু আসুক, তখন যা-হয় ভেবে চিন্তে একটা ব্যবস্থা করা হবে।

ভোলার ঠোঁট ও কপাল ফেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে, ওরা প্যাণ্ডেলের খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে নারকেল কাতার দড়ি দিয়ে বেঁধেছে, নড়তেও কষ্ট হচ্ছে। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। একটু আগেও খিদেয় পেট টন্‌টন্ করছিল। এখন অবশ্য খিদে তেমন নেই। কাল রাতে হোটেলে তিনটে রুটি আর একটু কুমড়োর তরকারি পেয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে আবার একটা রুটি পোড়া—খেতেই পারেনি, ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওপরের পাটটা ফেলে দিয়ে নিচেরটা খেয়েছিল, কিন্তু পেট ভরেনি। ঢক্‌ঢক্ করে দু গেলাস জল খেয়ে নিয়েছিল। ও জানে বেশি করে জল খেলে খিদে ভাব থাকে না। রাত বারোটা নাগাদ হোটেলের মেঝেতে দুটো চটের বস্তা লম্বালম্বি বিছিয়ে শুয়ে পড়ে, প্রতিদিনের মত উড়ুক্কু আরশোলা আর নেংটি ইঁদুর গায়ের ওপর দিয়ে ফরফর করে বেয়ে যাচ্ছিল, ও ওর তেল চিটচিটে চাদরটা ভাল করে মুখ পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। চাদরের ওপর দিয়ে ওরা গেলে সুড়সুড়ি লাগেনা।

রাত তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেল। খিদেয়। পাশে তাকিয়ে দেখে মেদনীপুরের কেলে মোটা মদন বুড়ো ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। শালার মৃত্যু ঘুম। কী রাঁধে তার ঠিক নেই—কিন্তু বচনের দেড়ে। একটু এদিক ওদিক সটকালেই

বাবুর কাছে নালিশ। 'মর্ শালা' বলে বিরক্ত মুখে আস্তে আস্তে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল যদি কাল রাতের কিছু ভাল জিনিষ বেঁচে থাকে। ধ্যুস্ শালা, হাঘরে হোটেল! মাছ মাংস কিস্যু পড়ে নেই। গুটি কতক শুকনো কড়কড়া ভাত; ভাঙা তোবড়ানো এনামেলের হাঁড়িতে আর চোঁওয়া চোঁওয়া আলুভাজা কটা পড়ে আছে। তাই সই। ভাত থেকে কটা আরশোলা সরিয়ে দু গাল আলুভাজা দিয়ে গপাগপ্ মুখে পুরে দিল। ভটকা গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল কাল রাতে আসার সময় দেখে এসেছে মা দুগ্গার সামনে অনেক ভোগ দেওয়া হচ্ছে—দই-মিষ্টি-সন্দেশ—লুচি। ওর জিভে জল এসে গেল। চাদরটা মুড়ি দিয়ে চুপিসাড়ে পিছনের পাঁচিল টপকে প্যাণ্ডেলের পশ্চিম দিক থেকে গুড়িগুড়ি ঢুকে পড়ল। দুটো লুচিও খেয়েছে কিন্তু সন্দেশের ডালায় হাত দিতে গিয়ে এই বিপত্তি। পাশে জলের গ্লাস ছিল, অসাবধানে পড়ে গিয়ে শব্দ হতেই হারামির বাচ্চারা—।

ভোর ফুঁড়ে সকাল বেরুতেই পালবাবু আর কয়েকজন পূজোর কর্তাব্যক্তি পূজো মণ্ডপে ঢুকলেন। ভোলার দিকে ভাল করে একটু দেখে পালবাবু বললেন—আরে, এতো রায়পাড়ার বস্তির বিশু মাতালের ছেলে। ও বাবা—ওইটুকু বিটলে এর মধ্যে এরকম দাগি চোর হয়ে গেছে। যে যার মতো মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। একজন বললে—হবে না বস্তির মাল যে! ওরা মায়ের পেট থেকে পড়েই হাত সাফাই শিখে যায়। পূজোর প্রেসিডেন্ট বুড়ো চক্রবর্তীবাবু বললেন—দেশে যে বন্যা মহামারী হচ্ছে কেন বুঝলেন এবার? এইসব মহাপাতকদের জন্যে—মহাপ্রসাদ তো এঁটো করলি, মা লক্ষ্মীর অঙ্গহানি পর্যন্ত করলি! ঘোরকলি। দেখতে দেখতে পূজো মণ্ডপ ভিড়ে জ্যাবজ্যাব হয়ে উঠল। অন্য প্যাণ্ডেল হলে হয়তো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তো, কিন্তু এ প্যাণ্ডেল করা হয়েছে তনুপুকুর পার্কের দুদিকে দুটো মোটা গাছ কেটে তার গুঁড়ির ওপর, ফলে বেশ শক্তপোক্ত। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। ওর মধ্যে একজন মেয়ে বললে—আহারে ঠোঁটে, মুখে রক্ত শুকিয়ে গেছে। ভোলার গা হাত ব্যথায় টনটন করছে, এতক্ষণ খিদের কথা মনে হয়নি কিন্তু এখন যেন বড্ড খিদে খিদে পাচ্ছে।

ভিড় ক্রমশ বাড়ছে দেখে পালবাবু একজনকে বললেন—ওরে সন্তু, ওর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়, জরিমানা করে ছেড়ে দেব। সকলে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভাল। কয়েকজন অতি উৎসাহী ছেলে ছুটে গেল রায়পাড়ার বস্তিতে। সব শুনে ওর বাবা বললে—শালাকে রেল লাইনে শুইয়ে দাও। ওর মুখ যেন আমার আর না দেখতে হয়। ওর সৎমা বললে—ফের যদি এমুখো হয়েছে মুখপোড়া, ঝাঁটা মেরে ওর মুণ্ডু থেঁতে দোব। ছেলেরা এসে ওর বাপ মায়ের জবাব শোনাতে পালবাবু বেশ মুশকিলে

পড়লেন। ভোলার চোখ ঘুমে ঢুলে আসছে। চোখ দুটো কখনো আপনা আপনি ঘুমে বুঁজে আসছে আবার কখনো খুলে যাচ্ছে। পুজো বাড়ির ছেলে মেয়েরা যে পারছে খোঁচা মেরে যাচ্ছে—ওর মধ্যে একজন বললে—ওই দ্যাখ্ হারামির বাচ্ছা কুতকুত করে কেমন তাকাচ্ছে। একজন বললে—শোনো, ওতো ওই রাজ হোটেলে কাজ করতো। তা হোটেলের মালিককে ডেকে তার হাতে তুলে দাও—যা হয় একটা জরিমানা করে। কথাটা সকলের বেশ মনে ধরলে। ডেকে আনা হল হোটেলের মালিক বিপিনবাবুকে। বিপিনবাবুর আসার ইচ্ছা ছিল না, কে বাপু এই উটকো ঝামেলায় মাথা দেয়। দোকানে কাজ করে, খায়দায় মাইনে পায়, ব্যাস। তার বেশি দাম সে দেবে কেন! আর যখন তার নিজের বাপ ছেলের দায় নিতে অস্বীকার করেছে তখন পর হয়ে সে আর কী করবে। কিন্তু পূজা বাবুদের চটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন—আরে হারামির বাচ্ছা মরেনি এখনো, দাও না হাড়গোড় পিষে। এসব আপোদ বাঁচিয়ে রাখবার দরকার কী। কী চোর রে বাবা। দোকানে ফাঁক পেলেই চুরি করবে। পেটে যেন হাঁস বসানো আছে। সবসময় ছুঁকছুঁক করছে। না-না—ও শয়তানকে আমি আর জায়গা দিচ্ছি না। ঢের ঢের বিচ্ছু দেখেছি বাবা এরকম হাড়ে হাড়ে শয়তান আমি জীবনে দেখিনি। কী গু খোরি করে আমি যে কাজে রেখেছিলুম। বাপ সকলরা ঠাকুরের হাত মুচড়ে কেউ ভোগ খেতে পারে এ কেউ কখনো শুনেছে? তা অমন করে না লোক জমিয়ে দ্যান না থানা পুলিশে। পালবাবু মানুষটা আবেগপ্রবণ। ছেলেটার অবস্থা দেখে মনে মনে মায়া হচ্ছিল আবার রাগও হচ্ছিল এই ভেবে যে এবারে শারদ পুরস্কার পাওয়ার আশাটা গেল। আজও নবমীর দিনে নানান সংস্থা থেকে ঠাকুর দেখতে আসবে। অঙ্গহানি ঠাকুরকে কি তাদের মনে ধরবে! ওদিকে পাশেই ব্যানার্জী পাড়ার ঠাকুর। দু পাড়ার মধ্যে খুব আকচা আকচি। ছেড়ে দিলে ওরা খুব হাসাহাসি করবে। সাতপাঁচ ভেবে বললেন—হ্যাঁ পুলিশে দেওয়াই ঠিক, কী বলো চক্কোত্তিদা। চক্রবর্তীবাবু বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন কুকুর তেমন মুগুর দরকার। পুলিশের গুঁতো খেয়ে বাছাধন বুঝুক কত ধানে কত চাল। ঘন্টাখানেক পরে দু জন পুলিশ এসে বাঁধন খুলে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে গাড়িতে তুলে বলল—ঠাকুর ঘরে চুরি। চল হারামির বাচ্ছা মজা দেখাচ্ছি...।

পথে কেউ তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। থানায় পৌঁছে গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা লোহার খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। গায়ের কাছে বন্দুক কাঁধে পুলিশ দেখে তার ভয়ে বুক উড়ে যাচ্ছে—জীবনে এত কাছ থেকে সে কখনো পুলিশ দেখেনি, এতো কাছে যে তাদের গায়ের গন্ধ পর্যন্ত সে গরাদের ভেতর থেকে বুঝতে

পারছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সে ভয়ে ভয়ে বলল—একটু জল খাবো। ডিউটিতে যে কনেসটবল ছিল সে বলল—মুতে খানা। জল চাইলে কেউ মুতে খেতে বলে সে আগে কখনো শোনেনি। তাদের বস্তিতে অনেক গালাগালি সে শুনেছে কিন্তু কেউ জল চাইলে তাদের বস্তিতেও কেউ ফেরায় না। মনে হচ্ছে এবার সে মরে যাবে নির্ঘাৎ, যেন দমের কষ্ট হচ্ছে। সে ঝিমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ শুনল—লো বেটা পানি লো। সে চোখ খুলে দেখে একটা কালো দড় চেহারার মেয়ে একহাতে এক গ্লাস জল আর এক হাতে এক ঠোঙা মুড়ি দিয়ে বলল—খা লো ব্যাটা, বহুৎ ভুখ লাগিছে না। এতক্ষণ সে কাঁদেনি এবার সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল—রো মৎ ব্যাটা, রো মৎ বলে ঝাঁটাটা তুলে ঝম্‌ঝম্‌ করে পায়ের বেড়ি বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

দুমুঠো মুড়ি আর একটু জল পেটে পড়তেই ভোলার চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এল। সে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না, লোহার গরাদে ঢং ঢং আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে দেখে একটা খাকি পোশাকের পুলিশ হাতে রুটি আর তরকারি নিয়ে ডাকছে। সে ধড়মড় করে উঠে হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। পুলিশটা বলল—আজকের মত এই খেয়ে নে কাল সকালে চালান হয়ে যাবি সদরে। খাবারটা হাতে নিয়ে ভাবল যদি বিষ মেশানো থাকে? ও শুনেছে থানায় এনে নাকি লোক গুম করে দেয়। কি করবে, খাবে, না খাবে না? খেলে যদি মরে যায়? না খেলে এরা তো আবার মারবে। ঝা সব হোঁৎকা হোঁৎকা চেহারা। রুটির দিকে চেয়ে তার জিবে জল এসে গেল। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। তার মনে হল ধ্যুস, মরে যাইতো যাব। এ জীবনে বেঁচে আর কি হবে। সকলের নাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে আর ভাল নাগে না। সে মরে গেলেই বা ক্ষেতি কি। চোখ বুঁজিয়ে একটা রুটি খাবলে খেয়ে নিল। না, মাথা ঘুরছে না, বমি বমি পাচ্ছে না, রুটিকটা খেয়ে বরং এখন বেশ ভাল লাগছে। খুব জল তেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু জল চাইতে গেলে আবার ঝদি সেরকম বলে? তা বলুক, জল না খেয়ে তার শরীরটা বড্ড আই ঢাই করতেছে। সে ভয়ে ভয়ে বলল—একটু জল খাবো। যে পুলিশটা হাতে করে খৈনি ডলছিল—সে বলল—এ্যা, শালা লাট সাহেবের বাচ্চা। খাওয়া হল তো জল এর পরে হয়তো পান চাইবে। বাইরে চেয়ারে ঝে বাবু বসে ছিল, ঝার কাছে সব নোকজন আসতেছে আর কী সব নিখিয়ে যাচ্ছে, সে বলল—দাও, দাও জল দাও। না হলে কোথায় কী হতে বিপরীত হয়ে যাবে। আজকাল আইন খুব কড়াকড়ি। তুমি আমি ডিউটিতে আছি একেবারে ফেঁসে যাব। শালা রাস্তায় শ্যাল কুকুরের মত মানুষ মরে পড়ে থাকছে কারো কোন হুঁশ নেই, আর

তোমার থানায় যদি পান থেকে চুন খসেছে তো তুলকালাম। এই টিভি আর খবরের কাগজের লোকগুলো সবসময় ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে খবরের জন্যে। তোমার সঙ্গে এমনি হয়তো খুব পিরিত। দেখলেই হেঁ হেঁ করছে, কিন্তু যেমনি কিছু একটা ঘটল অমনি দেখবে তিলকে তাল করে ছাপাচ্ছে, ছবি দেখাচ্ছে। শালা, পুলিশের চাকরির মাথায় লাথি।

একজন এসে জল দিয়ে গেল। জল খেয়ে ভোলার বেশ একটা স্বস্তি-স্বস্তি ভাব হচ্ছে। কিন্তু একি। সব্বোনাশ! ছোট বাইরে যাওয়া পাচ্ছে যে। আগে কখন একবার ঘুমের ঘোরে ছোট করে হয়ে গেছে সে বুঝতে পারেনি, প্যান্টে হয়েছিল শুইকে গেছে। শুধু বাইরে থেকে একটা ঘের কাটা কাটা সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে। ও যাকগে, কিন্তু এখন কী হবে? এবার ঝদি বলে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে। কিন্তু নন্টুতো টন্‌টন্ করতেছে। কিছুক্ষণ এক পার ওপর আর এক পা ব্যাঙতা করে চেপে চাপবার চেষ্টা করলো, না কিছুতেই বেগ থামছে না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ফর্‌ফর্ করে পড়ে যাবে। যা হয় হোক সে আর সহ্য করতি পারতেছেনা। কিন্তু কি বলবে? মুত পেয়েছে? না না, সে সব বাইরে বলা যায় নাকি? সে ক'বছর তো ইস্কুলে গেছল। তখন যেন কি বলতে হত? ঠিক মনে পড়ছে না। অনেকক্ষণ ভাবার পর তার মনে পড়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ বাঁ হাতের কড়ে আঙুল তুলে বলতি হয় 'বাইরে যাব'। এতক্ষণ ধরে যে লোকটা খৈনী ডলছিল সে তো রে রে করে তেড়ে এল—সুমুন্দির পো, মেরে তোর থোপনা ভেঙে দোব। বাপের জমিদারিতে এ্যায়েচো। ভাত খাব, জল খাব, বাইরে যাব। পালানোর ধান্দা হচ্ছে। শালা ছিঁচকে, এমন হুলো দোব যে জন্মের মত নুলো হয়ে যাবি। আর হেঁটে বেড়াতে হবে না। ও আর চেপে থাকতে পারছে না দু-হাতে প্যান্টুল সমেত চেপে ধরে বলল—নাগো সে বাইরে নয়, 'মুত পেয়েছে'।—ওরে আমার শালা শুয়োরের বাচ্ছার মুত পেয়েছে—বাথরুমে নিয়ে যেতে হবে। কর শালা ওর ভেতরে ভাঁড় আছে ওতেই কর। অগত্যা কি আর করা—ছর্-ছর্ করে সেই ভাঁড়েই করল। উঃ বাবা, কি আরাম! কিন্তু যদি হাগা পায় কি করবে—এর ভেতর করতি হবে? এ্যা বাবা, সেতো খুব গন্ধ বেরোবে।

একটু পরে আর একটা চামড়াসার লোককে মারতে মারতে গরাদের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। কোমরে পেস্তল আঁটা একটা পুলিশ এসে বলল—এ শালা এবার বড়ো দাঁও মেরেছে, এম এলের বৌ-এর গয়নাগাটি সব সাবাড় করে দেছে। এত করে বলছি—ফেরত দে, শালা কিছুতেই কথা শুনছে না। আসছি, এসে হাড় মাস এক করে দেব। যতক্ষণ না কড়ার করছে ততক্ষণ কম্বল ধোলাই করব। পুলিশটা চলে গেল গজর গজর করতে করতে। লোকটা মুখ ব্যাজার করে বলে—ঢেমনীর

ভাইদের সঙ্গে সব আলাদা আলাদা বেবস্তা করতি হবে। মাসে মাসে বকরা দিই তেবু মন পোষে না। ওপর থেকে চাপ এলিই ধরে এনি গো ঠ্যাঙানি ঠ্যাঙাবে। ঠ্যাঙাবি যদি তবে পয়সা নিবি কেন? বাপের জমানো পয়সা? বলতিছি এবারেরটা আমি করিনি, তবু হারামির বাচ্চারা শোনে না। এর পরে দুটো চট এনে লোকটার গায় জইড়ে বাইরে টেনে দমাদম পিটল। লোকটা বাবাগো-মাগো বলে চেঁচাচ্ছে—আর পুলিশ দুটো-বল শালা কোথায় রেখেছিস বল, বলে চেল্লাচ্ছে। লোকটা মার খেতে খেতে বলতেচে—বলতিচি আমি ওটা করিনি তেবু শোনতোচোনা, মারো, মেরি মেরি মেরে ফ্যালো, জ্যাবনটা নি-নও, আর ভাল নাগেনা এ জ্যাবনে। এক ঝুল মেরে পুলিশ দুটো বাইরের দোকানিকে বলল—দুটো কড়া করে চা দে যা। দোকানি চা দিয়ে গেল। কে মার খেলে, কেন মার খেলে—এসব নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। এসব যেন জল ভাত, সে চা দিয়ে চলে গেল যেমন এসেছিল। পুলিশ দুটো বলল—কাল চালানের আগে আর এক প্রস্থ হবে।

ভোলার মাথায় দুটো জিনিষ কিছুতেই ঢুকছে না। মারতেচে তো নাগবার জন্যি, যন্তন্না দেবার জন্যি, তা তালি-চট জইড়ে মারতেছে কেনো, কম নাগবে বলে। মারবে আবার দরদ করবে? এদের এসব কী ব্যাভার-স্যাভার সে কিছুতেই হেউত করে উঠতি পারতেচে না। আর একটা ব্যাপার তার মাথায় তখন থেকে ঘুরপাক খাচ্চে, চালান করে দেবে? তাকেও বলেচে, ওই বড় চোরটারও বলেচে। সে শুনেছে গরু চালান হয়, সবজি চালান হয়। গরু চালান হয়তো মোচলমানেরা খাবে বলে। সবজি কলকাতার নোকেরা খায়, কিন্তু তাদের চালান দে কোতায় পাঠাবে? তবে কি জোবাই করবে? সে শুনেছে এইসব থানার ভেতরে কোতায় যেন গুমঘর আচে। ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করলি নাকি ঢুকিয়ে দে দোর টেনে দেবে। ভিতরি পচে পচে মরা। তার গা-কাঁটা দে উঠচে আর ভাবতি পারতেচে না। ভাবতি ভাবতি আরও এট্টা নোকেরে ভেতরে ঢুইকে দেল, বেশ গুন্ডা মত দোহারা চেহারা। সে সামনের পুলিশটারে হেসে হেসে বলল—আরে মিস্তিরি বাবু, ভাল আছেন তো?—হ্যাঁ ভাল আছি। এবারে যে অনেক দিন বাদে?—একটু বাইরের দিকে খেলছিলুম—বলে নোকটা মিট্ মিট্ করে হাসল। ও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে চোরটা ওর কানে কানে বলল—দেল বাহাদুর, বড় ডাকাত। ওরে এরা ভয় করে, খাতিরও করে। শুধু নোক দেকাবার জন্যি মাঝেমধ্যি ধরে আনে। শুমুন্দির পোয়েরা কম জিনিস। সোরকারের পয়সা খাবে আবার চোর-ডাকাতদের কাছ থেকে তোলা তুলবে।

ভোলা ভেবে পায়না এটা কেরম বিচার। চোরেরে সাপ ঠ্যাঙানি ঠ্যাঙাবে আর

ডাকাতেরে জামাই আদর করবে। ধ্যুস, এসব তার মাতায় ঢুকতেচেনা, সে আবার গুঁড়ি সুড়ি মেরে ঘুমিয়ে পড়ে।

তার ঘুম তখনোও খুব পাকালো হয়নি হৈ-চৈ শুনে উঠে পড়ে। দেখে চোরটা নিধাত মেরে শুয়ে আচে। ডাকাতটা ফুস্‌ফুস্‌ করে সিগ্রাট খাচ্চে আর ক'জন নোক দারোগাবাবুর সামনে কীসব ফুসুর ফুসুর-গুজুর গুজুর করতেচে। চোরটা বলতেচে শালারা এতক্ষণ হট্টগোল করতেছেল—এবার নিশ্চয় দেনাপাওনার কথা হচ্ছে তাই চুপি চুপি। ওই শালা জগাই তো কাল বেপক্ষের একটা নোকেরে খুন করেছে, তবু ওরে গরাদের ভেতর রাখবেনে, বইসি বইসি জামাই আদর করবে। ভোলা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে—আরে ওইতো পূজো কমিটির পালবাবুর গলা শোনা যাচ্চে। পালবাবু দারোগা বাবুকে বলতিচে—জগাই আর দেলবাহাদুরের কেসটা একটু হালকা করি দেবেন, আপনারটা আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন, আমি কথার খেলাপ করিনা। ভোলাতো অবাক। দুটো নুচি খাবার জন্যি ঝে পালবাবু তারে জেলে দিল সেই নোকটা রাত্তিরের বেলা ডাকাত-খুনের জন্যি ওমেদারি করতেচে!—সে মনে মনে একটা গালাগালি দিয়ে গরাদের ভেতর খ্যাক করে থুতু ফেলল...।

সকাল হতেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। এদের সব সদরে চালান করতে হবে। বড়বাবু এসে বললেন—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়, দেরি হলে আবার নানান কৈফিয়ত দিতে হবে। আর হ্যাঁ দেখো যেন গাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে সব ঘুমিয়ে পড়োনা, এদের এক একজনের গুণের তো শেষ নেই। হয়তো মাওবাদীদের সঙ্গে যোগ আছে, পথে গাড়ি থামিয়ে আজাদ করে নিল। অস্তর বলতে ওইতো কটা গাদা বন্দুক। আমাদের অবস্থা হয়েছে সেই নিধিরাম সদ্দারের মত। ঢাল তলোয়ার ছাড়া যুদ্ধে যেতে হবে। প্রাণ গেলে তোমার পরিবারের গেল। এদের জন্যে তো হাজারো দাদা দিদি আছে। হঠাৎ ভোলার দিকে তাকিয়ে বলে—আরে এর তো দুদে মুখ ঘোচেনি। এ আবার কী করল? একজন কনেসটবল বললে—পূজামণ্ডপে চুরি করেছে। পূজামণ্ডপে চুরি করেছে? ছোঃ, ট্রাক ট্রাক মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে আর বুড়ির এক বোচকা চাল নিয়ে টানাটানি—এতো হয়েছে সেই অবস্থা। তা কেস টেস কিচ্ছু লেখা হয়েছে? ছোটবাবু বললেন—না-না,—পূজা কমিটির কেউ এসে কেস লেখায়নি, আমরাও লিখিনি। কেস একবার লিখলে তো হাজারো ঝক্কি, রিপোট করে করে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আর তাছাড়া শুধু সন্দেশ খেয়েছে বলে তো কেস লেখানো যাবেনা। ম্যাজিস্ট্রেটের বকুনি খেতে হবে। আপনি যদি বলেন তো বস্তির যে দুটো কেস-এ আসামী ধরা যাচ্ছে না এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চালান করে দিই? বড়বাবু ভোলার দিকে বার কয়েক আপাদ মস্তক তাকিয়ে বলল—মাল

এখনো পাকেনি মনে হচ্ছে। থানায় ফাইফরমাস খাটতো যে ছোকরা সে তো কদিন হল বেপাত্তা। বিহারীগুলোর ওই এক দোষ, এমনিতে ঠিক আছে, কিন্তু বাড়িতে গেলে কোনদিন কথার ঠিক থাকে না। সে বাবু বা চাকর, সব শিয়ালের এক রা। তা-একে দিন কতক তার জায়গায় রেখে দিলে হয় না? মনে হয় না খুব বেগড়বাই করবে।

ওদের দু'জন চালান হয়ে গেল। বড় বাবু ভোলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—বাপমা আছে? ছোটবাবু বললেন—থেকেও নেই, কেউ ওর দায় নিতে চায়নি। ও মুক্ত পুরুষ। বড় বাবু বললেন—শোন, থানার ফাইফরমাস খাট। যদি ভাল থাকিস অন্য ব্যবস্থা, না হলে একদম মেরে বাদাবনে ফেলে দিয়ে আসব, কাকপক্ষীও টের পাবে না। এখন যা দেখি, কেনটিন থেকে আমাদের জন্যে চারটে চা নিয়ে আয়, বলবি বড়বাবু বলেছে। পারবি তো? ভোলা মাথা নেড়ে চলে গেল। ও দিনে রাতে মিলিয়ে প্রায় একশ লোকের খাবার দিয়েছে একা হাতে আর এই চারটে চা দেওয়া তো তার কাছে নস্যি। প্লেটে করে খুব ধীরে ধীরে চারটে চা এনে বড়বাবুর টেবিলে রেখে দিল। চায়ের কাপ থেকে একটুও চা প্লেটে পড়েনি দেখে বড়বাবু বললে—ওরে, তুইতো বেশ করিৎকর্ম্মা ছেলে আছিস, তা হঠাৎ এমন দুর্মতি হল কেনো? ও কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। বড়বাবু বলেন—শোন, থানায় আর দুজন দারোগাবাবু আছেন—তাদেরও কথাবার্তা শুনবি, দেখা যাক তোর জন্যে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

থানায় বহাল হয়ে ভোলার ক'দিন বেশ কাটছে, এ দারোগার ও দারোগার ফাইফরমাস খাটছে—এ ও দু চার টাকা বকশিশও দিচ্ছে। খাওয়াদাওয়াও মন্দ হচ্চে না। তিন দারোগার মধ্যে বড়বাবু লোকটা বেশ ধর্ম-কর্ম পূজো পাঠ করে। সকালবেলা স্নান টান সেরে রোজ কিছুক্ষণ পূজায় বসা চাই-ই-চাই, যতো কাজই থাকুক না কেনো। থানার লাগোয়া তিন দারোগার তিনটে কোয়াটার। আর তার পাশে একটা ঘর, সঙ্গে রান্নাঘর কলঘর সকলের জন্যে, সেখানে ক'জন কনসটবলের সঙ্গে সেও থাকে। এই ক'দিন সে জেনে গেছে—কে বড়বাবু, কে মেজোবাবু আর কে ছোটবাবু। কোন কনস্টবল আর ক'দিন পরে দারোগা হবে। ও বুঝতে পারে বড়বাবু ওকে ভালবাসে। বড়বাবু পূজোর জন্যে ওকে বাজার থেকে ফুল বেলপাতা কিনে আনতে বলে, ও সেগুলো খুব যত্ন করে আনে। মেজোবাবু নোকটা খুব হিংসুটে। ওর ফুল আনতে দেখলে বলে—শালা, কোন অজাত কুজাতকে দিয়ে পূজোর জিনিষপত্তর আনছে মা-কালীর দয়া না হয়ে মা কালীর ভূত প্রেতেরা কোনদিন বড়বাবুর ঘাড় মটকে দেবে। বাবা, কালী হচ্ছে কাঁচাখেকো দেবী। একটু এদিক ওদিক হিন্‌চিন্ হলে

আর রক্ষে নেই। সাঁইগুষ্ঠির দফারফা হয়ে যাবে।

বড়বাবু ঝখন পূজো করতে বসে বেশ লাগে। পূজো করা বামুন-ঠাকুরের মত বসে। ঝখন পূজো করতে বসে তখন ঝেন অন্য লোক। চোখে মুখে আলো-আলো ভাব। কী সব পুরুত ঠাকুরদের মত মন্ত্র বলে, মাঝে মাঝে আবার দু-চোখ দিয়ে জল পড়ে। তারপর ঝখন পূজো সেরে ওঠে মনে হয় ঝেন গাছের ধোওয়া পাতা, কেমন ঝেন ভিজে ভিজে। দেখলে তখন গড় করতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু না, ঝদি বকে। ঠাকুরটা কালী ঠাকুর, তবে বেশ দেখতে, একটা মা, মা ভাব আছে—আর সব কালী ঠাকুরের মত রক্ত মাখা কাটিকাটি ভাব নয়, দেখলে ভয় হয়না।

বড়বাবু একদিন পূজো সেরে বললেন—ঠাকুরটা চিনিস? ও বললে হ্যাঁ, এতো কালী ঠাকুর, সে অনেক দেখেছে। বড়বাবু বললেন নারে এ যে সে কালী নয়, এ হল দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী। জ্যান্ত দেবী। ঠিক করে যা চাইবি তাই পাবি। তবে হ্যাঁ, খুব সুদ্ধভাবে এক মন এক প্রাণ হয়ে চাইতে হবে, তবে পাবি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম শুনেছিস? ও মাথা নেড়ে না বলে। বড়বাবু বলেন—তোকে আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের গল্প শোনাবো। শুনলে তোর মন ভাল হয়ে যাবে। এদের নাম শুনলে পাপ কাজে আর তোর মন যাবে না। দেখবি যত অভাব-অনটন থাক এদের নাম করলে মনে সবসময় একটা হাসিহাসি খুশি খুশি ভাব থাকবে। সে এক আধদিন বড়বাবুর কথামত এদের নাম করেছে কিন্তু তার কিস্যু হয়নি। মনে খুশিভাবও আসেনি, যন্ত্রণাও জুড়োয়নি। সে একদিন ভরসা করে বড়বাবুকে বলে—কই এদের নামতো সে ক'দিন করেছে তার তো কিচ্ছু হয়নি। বড়বাবু হেসে বলেন,—ওরে, ধাপার মাঠের ময়লা কি একদিন প.রিষ্কার হবে? দেখবি তুই যদি সত্যি সত্যি লেগে থাকতে পারিস তোর হবেই হবে। ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার বিশ্বাসও হয় না আবার বড়বাবুকে দেখে অবিশ্বাসও হয় না। সে মাথা নেড়ে অন্য কাজে চলে যায়।

ভোলার মনে হয় মেজোবাবু লোকটি-শালা একটা ধ্যাকোড় মাল। পাকা কঞ্চির মতো চেহারা, শয়তানের মত চায়। মুখে সব সময় প্যাচাল পাড়ছে। বড়বাবুকে সব সময় গালমন্দ করছে। ও সব শোনে কিন্তু কিছু বলে না। বড়বাবু যে দিন বাইরে যায় সেদিন সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে মেজোবাবু গাল দেয়—শালা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, থানাটাকে একেবারে তীর্থক্ষেত্র বানিয়ে ছাড়বে। থানার কোন আট-ঘাট নেই। যেই আসে সেই খোঁজে—বড়বাবু আছে? যেন বড়বাবুই সব, মেজোবাবুকে ধর্ত্যব্যের মধ্যেই আনেনা, আর ক'টা দিন সবুর করো ও বুড়ো হাবড়া তো রিটেয়ার করবে—তখন এই শর্মাই চার্জে থাকবে। তখন বুঝবে বাছারা কত ধানে কত চাল। শালা,